Tito
Digitally signed by Tito
DN: cn=Tito, o=Muktadhara, c=AU
Date: 2004.12.13 11:13:47 +11'00'
Signature Not Verified

কমরেড মণিকৃষ্ণ সেন শোষণহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তাঁর সমগ্র জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। মেহনতী মানুষের মুক্তির জন্য লড়াই করেছিলেন আজীবন। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে এই উপমহাদেশের এক দীর্ঘ সময়ের ইতিহাস। সুতরাং মণিকৃষ্ণ সেনের জীবনী পর্যালোচনা পক্ষান্তরে একটি সময়ের ইতিহাস পর্যালোচনা। আর এই পর্যালোচনার জন্য প্রয়োজন দীর্ঘ পরিসরের। এখানে শুধুমাত্র জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বছর ভিত্তিক তাঁর বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস তুলে ধরা হয়েছে।

শৈশব, কৈশোর ও ছাত্রজীবন ঃ

১৯০৩ সালের ১ নভেম্বর রাজবাড়ী (ফরিদপুর) জেলার বেরাদী গ্রামে মণিকৃষ্ণ সেন জন্মগ্রহণ করেন। বাবার নাম বেনীমাধব সেন, মা প্রমদা সুন্দরী সেন। পাঁচ ভাই চার বোনের মধ্যে মণিকৃষ্ণ সেন ছিলেন তৃতীয়। বাবা বেনীমাধব সেন রংপুরের পীরগঞ্জের কাবিলপুরের জমিদারের সেরেস্তায় চাকরী করতেন। ছয় বছর বয়সে মণিকৃষ্ণ সেন রাজবাড়ী থেকে তাঁর পৈত্রিক বাড়ি কাবিলপুরে আসেন। জয়পুর হাটে তাঁর বাবার কিছু সম্পত্তি ছিল। বেনীমাধব সেনের চাউলের ব্যবসা ছিল সেখানে। মণিকৃষ্ণ সেনের যখন মাত্র আট বছর বয়স তখন তাঁর বাবা মৃত্যুবরণ করেন। বাবার মৃত্যুর পর পুরো পরিবার অসহায় হয়ে পড়ে। এসময় দোকানের কর্মচারীরা তাদের চাউলের গোডাউন লুট করে। আর একারণেই পুরো পরিবারকে চরম আর্থিক কষ্টে পড়তে হয়।

মণিকৃষ্ণ সেন পীরগঞ্জের কাবিলপুর মাইনর স্কুল থেকে ৬ষ্ঠ শ্রেণী পাস করে রাজবাড়ীতে তাঁর বোনের কাছে চলে যান। রাজবাড়ী হাই স্কুল থেকে তিনি অষ্টম শ্রেণী পাস করেন। এই স্কুলে পড়ার সময় তিনি মেলেরিয়ায় আক্রান্ত হন। এ কারণেই ১৯১৮ সালে রংপুরে ফিরে আসেন এবং কৈলাশরঞ্জন উচ্চ বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণীতে ভর্তি হন। কৈলাশরঞ্জন উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ১৯২১ সালে মেট্রিক পাস করেন। ১৯২৫ সালে কারমাইকেল কলেজ থেকে বি.এ এবং ১৯২৯ সালে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম,এ ও বি,এল পাশ করেন। কোলকাতা থেকে ফিরে এসে তিনি রংপুরে ওকালতি পেশায় যোগদান করেন। কিন্তু এই পেশার প্রতি তাঁর কোনই আগ্রহ ছিলনা। বরং সেই সময়ের বিভিন্ন ধরণের আন্দোলনের প্রভাব মণিকৃষ্ণ সেনের উপর পড়েছিল। তিনি যৌবনে দেশব্যাপী খেলাফত আন্দোলন, বৃটিশ বিরোধী আন্দোলন এবং রংপুরের বাতাসন পরগনার (বদরগঞ্জ) রায়ত বিদ্রোহের দ্বারা প্রভাবিত ও অনুপ্রাণিত হন। তিনি নিজেই বলেছেন, '১৯২০ সালে সতের বছর বয়সে ইংরেজ ভারত ছাড় এই ব্রত উদযাপনে বুকের রক্তে শপথ গ্রহণ করেছিলাম।' (রংপুরের আধিয়ার বিদ্রোহ ও তেভাগা আন্দোলন - ধনঞ্জয় রায়।) সুতরাং বুকের রক্তে নেওয়া এই শপথের কারণে তিনি শেষপর্যন্ত শুধুমাত্র একজন আইনজীবীতে পরিণত হতে পারেননি। দেশ ও মানুষের মুক্তির সংগ্রামে তার পুরোজীবন তিনি উৎসর্গ করেছিলেন। পরিণত হয়েছিলেন একজন আদর্শবান রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বে।

মণিকৃষ্ণ সেনের রাজনৈতিক জীবন ঃ

বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদের হাত থেকে ভারতবর্ষকে মুক্ত করার লক্ষ্যে সে সময় দুটি ধারায় আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। একটি ধারা ছিল গান্ধীবাদী অর্থাৎ অহিংস আন্দোলন। অন্যটি বিপ্লবীদের সহিংস পন্থায় স্বাধীনতা আন্দোলন। এই সন্ত্রাসবাদীদের দুটি দল ছিল, একটি 'অনুশীলন' আরেকটি 'যুগান্তর'। এই দুটি দলই রংপুরে শক্তিশালী ছিল। 'যুগান্তর' দলের যাঁরা অনুসারী ছিলেন তাঁরা সে সময় প্রকাশ্যে কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কাজ করতেন। '১৯২১ সালে মণিকৃষ্ণ সেন জাতীয় কংগ্রেসের কর্মী ছিলেন। তিনি ছিলেন গণঅভ্যুত্থানের অন্যতম সংগঠক ও যুব ভলান্টিয়ারদের প্রধান।' ১৯২৮ সালে তিনি 'যুগান্তর' দলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেসে যোগদান করেন।

১৯২৯ সালে মণিকৃষ্ণ সেন প্রথম গ্রেফতার হন। গ্রেফতার হওয়ার কারণ হচ্ছে বিপ্লবীরা রাজশাহীর পুঠিয়ায় মেইল ট্রেনে ডাকাতির প্রচেষ্টা চালায়। এই ঘটনায় তিনি অভিযুক্ত হন এবং গ্রামের বাড়ী কাবিলপুর থেকে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। এই সময় তিনি ৩/৪ মাস জেল হাজতে ছিলেন। এই মামালায় তাঁর কোন সাজা হয়নি।

১৯৩০ সালে রংপুর জেলার আইন অমান্য আন্দোলন পরিচালনার জন্য কংগ্রেসের পক্ষ থেকে মণিকৃষ্ণ সেনকে 'ডিরেক্টর' মনোনীত করা হয়। আন্দোলনের এক পর্যায়ে তিনি গ্রেফতার হন এবং ছয়মাস কারাদণ্ড ভোগ করেন। এসময় তিনি রাজশাহী, বহরমপুর ও দমদম জেলে বন্দী ছিলেন। জেলে থাকা অবস্থাতেই তিনি কমিউনিস্ট মতাদর্শের অনুসারীদের সংস্পর্শে আসেন।

'১৯৩২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বেঙ্গল অর্ডিন্যান্সে গ্রেফতার হন মণিকৃষ্ণ সেন।' রংপুর থেকে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় মেদিনীপুরের হিজলী স্পেশাল ক্যাম্পে। সেখানে তিন মাস বন্দী রাখার পর তাঁকে পাঠানো হয় রাজপুতনার নির্জন মরুভূমির দেউলী বন্দীশিবিরে। এক সাক্ষাৎকারে তিনি দেউলী বন্দীশিবিরের কষ্টকর দিনগুলির কথা বলেছেন। এই বন্দী শিবিরে থাকতেই তিনি মার্কসবাদ ও লেনিনবাদকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। বলা যায় বন্দীশিবিরের কষ্টকর ঐ দিনগুলোতেই বদলে যেতে থাকে তাঁর রাজনৈতিক ভাবনা; কেননা এই শিবিরেই তিনি পাঠ করেন কমিউনিজম সম্পর্কিত বিভিন্ন গ্রন্থ। তাঁর নিজের ভাষ্যে জানা যায়, 'দিনের বেলা ঘুমানোর অভ্যাস আমার ছিল না। আমি অন্যান্য রাজনৈতিক গ্রন্থাদির সঙ্গে কার্ল মার্কসের 'ক্যাপিটাল' (৩ খণ্ড) বিশেষ মনোযোগ দিয়ে পড়তাম।' (সাক্ষাৎকার ১৯৮৯) মণিকৃষ্ণ সেন দেউলী বন্দীশিবিরে থাকাকালে ১৯৩৪ সালে ভারত সরকার এক সার্কুলার জারী করেন। সেখানে বলা হয় সাজার মেয়াদ শেষ হলে কোন বন্দীকে দেশে ফেরত পাঠানো হবে না। দেশের বাইরে কোন বন্দী যেতে চাইলে সরকার সে ব্যাপারে সাহায্য করবে। সরকারের এই প্রস্তাব বন্দীরা প্রত্যাখ্যান করে এবং তারা এই প্রস্তাব বাতিলের জন্য আন্দোলন শুরু করে। মণিকৃষ্ণ সেন তাঁর সাক্ষাৎকারে বলেন, 'আন্দোলনের এক পর্যায়ে সরকারকে দাবী মেনে নিতে রাজি করানোর জন্য তাঁরা শুরু করেন অনশন ধর্মঘট। এই আন্দোলনের কাছে নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন ইংরেজ সরকার।' ১৯৩৮ সালে মণিকৃষ্ণ সেন মুক্তি লাভ করেন। এরপর তাঁকে রংপুর শহরের মুন্সিপাড়ার শিবকৃষ্ণ ভবনে অন্তরীণ রাখা হয়। তিনি তখন শুধুমাত্র সকাল ও সন্ধ্যায় মিউনিসিপ্যাল এলাকায় যাতায়াত করতে পারতেন।

১৯৩৮ সালে মণিকৃষ্ণ সেন কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করেন। ১৯৩৭ সালে রংপুরে কমিউনিস্ট পার্টির একটি অস্থায়ী জেলা কমিটি গঠিত হয় এবং ১৯৩৮ সালে রংপুর জেলা সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। ১৯৩৯ সালে মণিকৃষ্ণ সেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যপদ লাভ করেন। কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগদান করলেও তিনি ১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত রংপুর জেলা কংগ্রেসের সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মণিকৃষ্ণ সেন এই যুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ আখ্যাদিয়ে বক্তৃতা করেছিলেন। আর এই অপরাধে তাঁকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তিনি জামিনে মুক্তি পেয়ে নিজের বাড়িতে অন্তরীণ থাকেন। এই সময় মণিকৃষ্ণ সেনের কংগ্রেস কার্যালয়ে যাতায়াত নিষিদ্ধ হয়ে যায়।

১৯৩৯ সালের সাধারণ কৃষকদের তোলাগণ্ডি আন্দোলন রংপুরের গ্রামেগঞ্জে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পরে। বিক্রেতা গরীব কৃষকদের কাছ থেকে অত্যাচারী ইজারাদার জোর করে তোলা আদায় করত। এই তোলা আদায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন তৈরী হয়। যে আন্দোলন সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির বিশ্লেষণ, 'সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের দমননীতির আওতায় এই আন্দোলন স্বভাবতই দমননীতির বিরুদ্ধে ব্যক্তি স্বাধীনতা (রক্ষায়) ও যুদ্ধবিরোধী আন্দোলনের সহিত যুক্ত হইয়া রাজনৈতিক আন্দোলনে পরিণত হয়।' ('স্বাধীনতা যুদ্ধে রংপুর' বইয়ে সুধীর মুখার্জীর রিপোর্ট) এই আন্দোলনের সময় কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম কর্মী ছিলেন মণিকৃষ্ণ সেন।

'১৯৪১ সালের ১ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় রংপুর জেলা কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম সম্মেলন।' এই সম্মেলনে অন্যান্যদের সঙ্গে মণিকৃষ্ণ সেন রিপোর্ট পেশ করেন এবং বক্তৃতা করেন ও জেলা কমিটির সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৪২ সালের মার্চ মাসে জাপান রেঙ্গুন দখল করে নেয়। যুদ্ধ তখন ভারত বর্ষের দ্বারপ্রান্তে। এই বছর কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূল্যায়ন করে 'জনযুদ্ধ নীতি' নাম দিয়ে এক নতুন নীতি গ্রহণ করে। এই 'জনযুদ্ধ নীতি' জেলার সর্বত্র প্রচার করার জন্য জেলা কমিটির সভ্য মণিকৃষ্ণ সেনের উপর দায়িত্ব দেওয়া হয়। এই বছরই জেলা পার্টির সম্পাদক নির্বাচিত হন কমরেড মণিকৃষ্ণ সেন। ১৯৪২ সালের ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনে তিনি বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখেন।

১৯৪৩ সালে বাংলায় দেখা দেয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। (যা পঞ্চাশের মন্বন্তর নামে ইতিহাসে চিহ্নিত হয়ে আছে।) কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য লেখেন, 'আমার সোনার দেশে অবশেষে মন্বন্তর নামে।" এই মন্বন্তর রংপুর জেলাকেও গ্রাস করেছিল।

জেলায় চালু হয় লঙ্গর খানা, রিলিফ হাসপাতাল এবং রিলিফ কমিটি। এ সময় মণিকৃষ্ণ সেনের নেতৃত্বে সারা জেলায় ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজ দারুনভাবে সংঘটিত হয়েছিল। আর এরই ফলে পার্টির ভিত্তি সুদৃঢ় হয়েছিল সারা জেলায়। এই বছরই মে মাসে অনুষ্ঠিত হয় ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস। এই কংগ্রেসে রংপুর জেলা পার্টির ডেলিগেট হিসেবে যোগদান করেন মণিকৃষ্ণ সেন এবং যোগেশ সরকার। এই বছরই সাধারণ মানুষের মাঝে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সরবরাহের জন্য তৎকালীন রংপুর জেলা প্রশাসক মিঃ আঙ্গেয়ার গঠন করেন জেলা কনজুমার স্টোর। যার নামকরণ করা হয় 'আঙ্গেয়ার স্কিম'। এই স্কিম জনকল্যাণ না করে বরং সাধারণ মানুষকে শোষণের এক নতুন পন্থা হিসেবে দেখা দেয়। এই স্কিমের বিরোধিতা করে আন্দোলন শুরু হয়। অন্যান্যদের সঙ্গে মণিকৃষ্ণ সেন এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। এই আন্দোলন জেলা প্রশাসকের উপর একটি বড় আঘাত হিসেবে দেখা দিয়েছিল।

১৯৪৬ সাল তৎকালীন অবিভক্ত বাংলার জন্য একটি উল্লেখযোগ্য বছর। এ বছর অবিভক্ত বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ নির্বাচন। রংপুর জেলায় তপশিলী যে তিনটি আসন ছিল তার দুটি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে প্রাদেশিক পার্টি। এই নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করেন মণিকৃষ্ণ সেন। সাধারণ নির্বাচনের পরপরই শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই দাঙ্গা বন্ধের জন্য কমিউনিস্ট পার্টি জোড় তৎপরতা চালায়। হিন্দু-মুসলিমের এই ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গায় যখন বিভিন্ন অঞ্চলে রক্তের স্রোত বয়ে যাচ্ছিল ঠিক সেই সময়ই বাংলার ১৯টি জেলায় হিন্দু-মুসলমান কৃষকরা একত্রিত হয়েছিলেন বাঁচার দাবিতে আন্দোলন করার জন্য। বাংলার ইতিহাসে সেই আন্দোলন তেভাগা আন্দোলন নামে সুপরিচিত। 'সারা পৃথিবীতে যতগুলি বিরাট বিরাট কৃষক আন্দোলন হয়েছে তেভাগা তার অন্যতম।' এই তেভাগা আন্দোলনে মণিকৃষ্ণ সেন নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। 'তেভাগার সংগ্রাম চলাকালে এক পর্যায়ে জোতদারের অস্ত্রসজ্জিত লোকদের অতর্কিত হামলায় গুরুতর আহত হন মণিকৃষ্ণ সেন।' এ বিষয়ে বিস্তারিত তথ্যের সন্ধান মেলে প্রখ্যাত চিত্রশিল্পী সোমনাথ হোরের লেখা 'তেভাগার ডাইরী'তে।

১৯৪৭ সালে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়। পাকিস্তান থেকে অনেক হিন্দু পরিবার চলে যান ভারতে এবং ভারত থেকে অনেক মুসলিম পরিবার চলে আসেন পাকিস্তানে। মাটি ও মানুষের প্রতি ভালবাসার কারণে মণিকৃষ্ণ সেন দেশ ছাড়েননি। তাঁর আত্মিয় স্বজনরা সবাই চলে যান ভারতে কিন্তু দেশের মায়ায় মণিকৃষ্ণ সেন থেকে যান।

১৯৪৮ সালে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস। এই কংগ্রেসে রংপুর থেকে যে সব প্রতিনিধি যোগ দিয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মণিকৃষ্ণ সেন। এই কংগ্রেসে পাকিস্তানের জন্য আলাদা কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়। ভারতে নিষিদ্ধ ঘোষিত হয় পার্টি। পাকিস্তানেও চলে ব্যাপক ধরপাকড়। পার্টির কোন কমিটি আর প্রকাশ্যে কার্যকলাপ চালাতে পারে না।

১৯৫০ সালে কমিউনিস্ট পার্টির রংপুর জেলা কমিটি গঠিত হয়। এসময় ব্যাপক ধরপাকড়ের কারণে মণিকৃষ্ণ সেন আত্মগোপন করেন। দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসের নীতি ও কর্মসূচীকে মণিকৃষ্ণ সেন মনেপ্রাণে গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি সেই লাইনকে হটকারী মনে করে প্রতিবাদ করেছিলেন। একারণেই তাঁর সদস্যপদ সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে যায়। এই বছরই আবার শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। এই দাঙ্গায় অনেকেই ভিটে মাটি ছাড়তে বাধ্য হয়েছিল। কিন্তু মণিকৃষ্ণ সেন দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি ভালবাসার কারণে এবারও দেশ ছাড়েননি।

১৯৫১ সালে পার্টি 'রণদিভের' হটকারী লাইন থেকে সরে আসে। পার্টিতে দেখা দেয় নবীন নেতৃত্ব। ১৯৫১ সালে জেলাপার্টির নতুন নেতৃত্বে যারা অধিষ্ঠিত হন তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মণিকৃষ্ণ সেন।

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময় মণিকৃষ্ণ সেন আত্মগোপনে থেকেও আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এই সময় তিনি পার্টির প্রাদেশিক কমিটির শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালানার সাথেও যুক্ত ছিলেন এবং খুলনা ও চট্টগ্রামে গিয়ে পার্টির কর্মীদের রাজনৈতিক ক্লাস নিতেন।

১৯৫৫ সালের ৬ জুন গঠিত হয় আবু হোসেন সরকারের যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা। এ সময় আত্মগোপন অবস্থা থেকে মণিকৃষ্ণ সেন বেরিয়ে আসেন। এই সময় পার্টির প্রাদেশিক কমিটির সদস্য ছিলেন মণিকৃষ্ণ সেন। এই বছরই তাঁকে আবার গ্রেফতার করা হয়। ১৯৫৬ সালে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে বর্তমান গাইবান্ধা জেলার সর্দারের চরে কৃষক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সমাবেশের মধ্যদিয়ে ঝিমিয়ে পড়া কৃষক আন্দোলন আবার জোড়দার হয়ে উঠে। মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে কৃষক সমিতিকে জোড়দার করার লক্ষ্যে অন্যান্যদের সঙ্গে কমরেড ছয়ের উদ্দীন ও কমরেড মণিকৃষ্ণ সেন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

১৯৫৭ সালে মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে গঠিত হয় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ)। এই ন্যাপ গঠনের ক্ষেত্রে মণিকৃষ্ণ সেনের অন্যতম ভূমিকা ছিল। এই সময় মওলানা ভাসানীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে। ১৯৫৮ সালে পেশোয়ারে অনুষ্ঠিত হয় পাকিস্তান ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির কেন্দ্রীয় সম্মেলন। এই সম্মেলনে মণিকৃষ্ণ সেন যোগদান করেন।

১৯৫৮ সালের ৮ অক্টোবর মণিকৃষ্ণ সেন গ্রেফতার হন। প্রথমে রাজশাহী ও পরে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে তাঁকে রাখা হয়। ১৯৬৫ সালের ২ জানুয়ারী ঘোষিত হয় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ। তখন জেনারেল আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট। আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে নির্বাচনের জন্য বিরোধী দলের সমন্বয়ে গঠিত হয় 'কপ' (কম্বাইন্ড অপজিশন পার্টি) অর্থাৎ সর্বদলীয় বিরোধী মোর্চা। এই নির্বাচনী প্রচারণায় মণিকৃষ্ণ সেন সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

১৯৬৮ সালের অক্টোবর মাসে পূর্বপাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির প্রথম কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয়। এই কংগ্রেসে পূর্বপাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টিকে একটি স্বাধীন পার্টিতে পরিণত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তখন মণিকৃষ্ণ সেন কারাগারে ছিলেন এবং ২২ ফেব্রুয়ারি মুক্তিলাভ করেন।

১৯৭০ সালে শ্যামপুরের চিনিকলে আঁখ চাষিরা ধর্মঘট করেন। রংপুরের টাউন হলে কৃষকদের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। এই সময় মণিকৃষ্ণ সেন অন্যান্যদের সঙ্গে আঁখচাষীদের আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন।

মুক্তিযুদ্ধ ও মণিকৃষ্ণ সেনঃ

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধের সময় কমিউনিস্ট পার্টি, ন্যাপ ও ছাত্র ইউনিয়নের কয়েক সহস্র নেতা কর্মীর সমন্বয়ে গঠিত হয় গেরিলা বাহিনী। মার্চের উত্তাল দিনগুলিতে মণিকৃষ্ণ সেন ছিলেন ঢাকায়। ২৮ মার্চ আসেন তাঁর পীরগঞ্জের গ্রামের বাড়িতে। এরপর তিনি কোলকাতায় যান এবং সেখানে তাঁর যোগাযোগ হয় মুক্তিযুদ্ধের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে। মুক্তিযুদ্ধের প্রথম দিকে কোলকাতায় পশ্চিমবঙ্গের আইন পরিষদের তৎকালীন সদস্য এবং রাজশাহীর নাচোলের কৃষক আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী ইলা মিত্রের বাসভবনে স্থাপিত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধের একটি কেন্দ্র। এই কেন্দ্র থেকে সীমান্তবর্তী এলাকায় স্থাপিত শিবিরে প্রশিক্ষণরত মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্যবস্তু ও ওষুধপত্রের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এই কেন্দ্রের দায়িত্বে ছিলেন মণিকৃষ্ণ সেন। তিনি রংপুরের মুক্তিযোদ্ধাদের সংগঠিত করেন। কুচবিহারের তুফানগঞ্জে মুক্তিযোদ্ধাদের যে শিবির ছিল সেই শিবির পরিচালনা করতেন তিনি। '৭১ এর অক্টোবর মাসে রংপুর জেল ভেঙে অসংখ্য কারাবন্দী এসে মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করেন। এসময় তাঁরা মণিকৃষ্ণ সেনের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে মুক্তিযুদ্ধ সংগঠিত করার জন্য North Bengal Revolutionary Council গড়ে উঠেছিল। মণিকৃষ্ণ সেন এখানে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। এছাড়া তিনি কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ীতে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য হাসপাতাল গড়ে তোলেন। এর খরচ তিনি নিজেই সংগ্রহ করতেন। দেশ পাকিস্তানী বাহিনীর কবলমুক্ত হলে ১৬ ডিসেম্বর তিনি মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে রংপুর শহরে প্রবেশ করেন। ১৯৭২ সালে যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থদের পুর্ণবাসনের জন্য পার্টি এক কর্মসূচী গ্রহণ করলে এই কর্মসূচীতে মণিকৃষ্ণ সেন নেতৃত্ব দেন।

১৯৭৩ সালে ৪ থেকে ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় প্রথম প্রকাশ্যে অনুষ্ঠিত হয় কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস। এই কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন মণিকৃষ্ণ সেন।

১৯৭৪ সালে দেশব্যাপী দেখা দেয় দুর্ভিক্ষ। এই সময় দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের পাশে এসে দাঁড়ান মণিকৃষ্ণ সেন। এই বছরই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে গঠিত হয় একটিমাত্র রাজনৈতিক দল, 'বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ' (বাকশাল)। পার্টির সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মণিকৃষ্ণ সেন এর পক্ষ অবলম্বন করেন। ১৯৭৫ সালের ৪ নভেম্বর তিনি কোলকাতায় যান এবং সেখানে অসুস্থ হয়ে পড়েন।

১৯৭৯ সালে মণিকৃষ্ণ সেন কোলকাতা থেকে দেশে ফিরে আসেন। এই বছর ডিসেম্বর মাসে পার্টির প্লেনাম অনুষ্ঠিত হয়। এই প্লেনাম চলাকালীন তাঁর স্ট্রোক হয়। তাঁকে ভর্তি করা হয় সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে। এখানে তিনি একমাস ছিলেন। ১৯৮০ সালে অনুষ্ঠিত হয় পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস। এই কংগ্রেসে তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির অন্যতম সদস্য নির্বাচিত হন।

১৯৮১ সালে আবারো বেআইনী ঘোষিত হয় কমিউনিস্ট পার্টি। মণিকৃষ্ণ সেনকে গ্রেফতার করা হয়। রংপুরে কারাগারে থাকার সময় তাঁর পুনরায় স্ট্রোক হয়। তাঁকে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়। ফেব্রুয়ারী মাসে তিনি চিকিৎসার জন্য কোলকাতায় যান।

'১৯৮৪ সালের ১মার্চ শহীদ হন শ্রমিক নেতা কমরেড তাজুল ইসলাম। এই বছর কোলকাতা থেকে রংপুরে ফিরে এসে শহরের নিকটবর্তী রাজেন্দ্রপুর গ্রামে আত্মগোপন করেন মণিকৃষ্ণ সেন। একমাস তিনি ছিলেন আত্মগোপনে। এরপর তিনি প্রকাশ্যে থাকার সুযোগ লাভ করেন। এরশাদ বিরোধী আন্দোলন চলাকালে রংপুর শহরের মুলাটোলে শিবকৃষ্ণ ভবনে তিনি ছিলেন। এসময় তিনি কোর্টেও নিয়মিত যাতায়াত করতেন।'

১৯৮৫ সালে মণিকৃষ্ণ সেন স্বর্গীয় মাতার নামে প্রতিষ্ঠা করেন প্রমদা সুন্দরী সেন কল্যাণ ট্রাস্ট। এই ট্রাস্টে তিনি দান করেন উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত কাবিলপুরের বাড়ি ও জমি। ঐ বছরই তিনি বিষ্ণুপুর হাইস্কুল তাঁর প্রয়াত পিতার নামে নামকরণ করেন।

১৯৮৭ সালে অনুষ্ঠিত হয় কমিউনিস্ট পার্টির চতুর্থ কংগ্রেস। এই কংগ্রেসে মণিকৃষ্ণ সেন নির্বাচিত হন কমিউনিস্ট পার্টির কন্ট্রোল কমিশনের সদস্য।

১৯৮৮ সালের ২ আগস্ট রংপুর পৌরসভার পক্ষ থেকে মণিকৃষ্ণ সেনকে শ্রেষ্ঠ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হিসেবে সম্মানিত করা হয়।

১৯৯০ সালের ১৯ মে অনুষ্ঠিত হয় রংপুর জেলা কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চম সম্মেলন। সম্মেলনে কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মেহনতী মানুষের সংগ্রামী নেতা মণিকৃষ্ণ সেনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এই বছরই ২৮ জুলাই বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা কমরেড মণি সিংহের ৯০তম জন্মবার্ষিকী পালিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টি,এস,সি হলরুমে। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন মণিকৃষ্ণ সেন।

১৯৯১ সালের জানুয়ারি মাসে রংপুরের পাবলিক লাইব্রেরী মাঠে অনুষ্ঠিত হয় কৃষক ও ক্ষেতমজুর সমাবেশ। এই সমাবেশে সভাপতিত্ব করেন মণিকৃষ্ণ সেন।

১৯৯১ সালের এপ্রিল মাসে চিকিৎসার জন্য তিনি শেষবারের মত কোলকাতায় যান। এই সময় তাঁর শারিরীক অবস্থা ক্রমান্বয়ে খারাপের দিকে যাচ্ছিল। তাঁর আত্মীয় স্বজনরা সবাই ছিলেন ভারতে। তাঁরা তাঁকে জীবনের শেষ

দিনগুলি তাঁদের সঙ্গে কাটানোর জন্য বিনীত অনুরোধ করেছিলেন। কিন্তু দেশের প্রতি ভালবাসার কারণে দেশে ফেরার জন্য তাঁর মন উদগ্রীব হয়েছিল। তাঁর এই সময়ের মানসিক অবস্থার কথা পশ্চিমবঙ্গের কমরেড শান্তি সান্যালের লেখা থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে। তিনি লিখেছেন, "এখানে খুবই নিঃসঙ্গ (মণিকৃষ্ণ সেন), রোগ ভোগের ব্যাপারটাই বড়। তাই অসহনীয়। রংপুরে থাকলে চিত্র অন্য হত। দ্বিধাসংকোচে আমি বলেছিলাম শরীরের এ অবস্থায় ফিরে যাওয়া কি সম্ভব? আমার বলা সান্ত্বনা, ধৃষ্টতাও বলতে পারেন। তবু বলি। শেষের দিনগুলি এখানে আত্মীয়স্বজনের মধ্যেই থাকুন। আমরাও মাঝে মাঝে এসে দেখা করে যাব। আমাদেরও ভাল লাগবে। একটু হাসলেন। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, দেখ, এখানে আমি কে? দেশ ভাগ না হলে অন্য ব্যাপার হতে পারত। দেশভাগ হয়ে যাওয়ার পর থেকে ওদেশেই আছি। কতকিছু ঘটে গেল। বাংলাদেশ স্বাধীন হল। এখানে অনিবার্য ভাবেই আমি কোন ফ্যাক্টর নই। পরিচিতদের সকলেই আসে না। কেউ কেউ আসে। ওখানে আমি বাড়িতে বসে থাকলেও ফ্যাক্টর। পক্ষে হোক, বিপক্ষে হোক, আমাকে কেন্দ্র করে আলোচনা হবেই। আমার বাড়িতে সর্বদাই মানুষজনের আসা-যাওয়া চলবে। এসব ছেড়ে এখানে থেকে গেলে আমার আর কিছুই থাকবেনা।" (মণিকৃষ্ণ সেনঃ স্মরণীয়/ বরণীয়-শান্তি সান্যাল) মণিকৃষ্ণ সেনের এই আকাঙ্ক্ষা অপূর্ণই থেকে গেছে। কোলকাতায় তাঁর একটি অপারেশন হয়েছিল। এরপর তিনি বিহারের রাজধানী পাটনার নিকটবর্তী দানাপুরে যান। সেখানে ছিলেন তাঁর অনুজ প্রয়াত ডাঃ প্রফুল্লকুমার সেনের দুই ছেলে অনিল সেন ও সুশীল সেন। এখানেই তিনি তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলি অতিবাহিত করেছিলেন। তিনি যখন দানাপুরে তখন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হচ্ছিল কমিউনিস্ট পার্টির পঞ্চম কংগ্রেস (৩ - ৮ অক্টোবর, ১৯৯১)। মনে তীব্র বাসনা ছিল ফিরে আসবার। তাঁর দেশ, মাটি ও মানুষের সঙ্গে লগ্ন হবার। যে দেশকে ঘিরে তিনি স্বপ্ন দেখেছেন, শোষণমুক্ত একটি দেশ গড়ার জন্য বেছে নিয়েছিলেন কঠিন ব্রত। সেই দেশে শেষপর্যন্ত তাঁর ফেরা হয়নি। ১৯৯১ সালের ২৮ অক্টোবর মেহনতী জনতার কাছের মানুষ, কমিউনিস্ট পার্টির ত্যাগী নেতা কমরেড মণিকৃষ্ণ সেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মানুষ এখনও শোষণের যাতাকলে পিষ্ট হচ্ছে। নির্যাতিত হচ্ছে মানবাত্মা। সম্পদের অসম বন্টনের কারণে শ্রেনীবিভাজন তীব্র ও উলঙ্গ হয়ে উঠছে। এ অবস্থায় খুবই জরুরী মণিকৃষ্ণ সেনের মতো ত্যাগী কমরেডদের জীবনইতিহাস চর্চা করা। সংগ্রাম শেষ হয়নি। নবযুগ এখনও আসেনি। সেই অনাগত নবযুগের জন্য প্রয়োজন নতুন সৈনিক যাঁরা মণিকৃষ্ণ সেনের জীবন থেকে প্রেরণা নিয়ে এগিয়ে চলবে শোষণ মুক্ত বিশ্বগড়ার লক্ষ্যে।